মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন প্রজন্ম

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুরু করছি। আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে আমার খুব বন্ধু মানুষ মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়া। উনি আসার সময় বলছিলেন, 'আপনার অনুষ্ঠানের সভাপতি মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী খুব ভুলো মনের মানুষ। উনি মাঝেমধ্যে আমাদের দাওয়াত দিয়ে ভুলে যান যে দাওয়াত দিয়েছেন। বাসায় গিয়ে দেখি ভাবীকে বলা হয়নি ফলে রান্নাও হয়নি। আবার অনেক সময় হয় যে, উনি ওনার ওয়াইফকে বলেছেন এবং খুব রান্নাবান্না করা হয়েছে এবং উনি ভুলেই গিয়েছেন অন্যদের বলতে। এবং পরে হঠাৎ তার খেয়াল হয় সবাইকে ডাকাডাকি করে যে তোমরা চলে এসো তাড়াতাড়ি।' আজকেও সে ধরনের একটা ব্যাপার হয়তো ঘটেছে। উনি এখনও এখানে এসে উপস্থিত হননি। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আজকে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। যারা নতুন প্রজন্মের মানুষ তারা তো আছেই, যারা পুরোনো প্রজন্মের তাদের অনেকেই উপস্থিত আছেন। যেমন এখানে আমাদের ড. আতিউর রহমান সাহেব আছেন, বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। সিমিন হোসেন রিমি আছেন, আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ, বড় লেখিকা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন যে তাজউদ্দিন আহমেদ, তার কন্যা। সঠিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার মতো একজন ব্যক্তিত্ব তাজউদ্দিন আহমেদ না থাকলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা কি হতো আমরা জানি না। আমার খুব প্রিয় গায়ক মাহমুদুজ্জামান বাবুকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে যাঁরা উপস্থিত থেকে একটা সম্মানিত, অত্যন্ত বড় অনুষ্ঠানে পরিচিত করেছেন তাদের মধ্যে আছেন মিলি রহমান। উনি বাংলাদেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের একজনের স্ত্রী। আপনাকে ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম। তিনিও আমার খুব বন্ধু মানুষ। বগুড়া জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। আমাদের বগুড়া জেলা স্কুলের একশ পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি সবার আগে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে হেঁটেছিলেন, তার পেছনে আমরা বগুড়া জেলা স্কুলের কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে ছিলাম। তিনি খুব সুন্দর একটা বই লিখেছেন বাংলাদেশের কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে বলব বইটা পড়ে দেখতে। বাংলাদেশের কিশোর, শিশু কিংবা কিশোরীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলো, তার ওপর চমৎকার একটা বই। এখানে উপস্থিত আছেন মাহবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক। আমি মনে করি আজকের এই অনুষ্ঠানে যে সব সম্মানিত ব্যক্তি আছেন তারা অনুষ্ঠানটিকে একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান রেখে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আমাদের দেশে নতুন প্রজন্মকে যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলতে হয় তারা একটা প্রশ্ন করে যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো? তাদের সমস্ত কিছু এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো। আজকে আমার বক্তব্য দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যখন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো তখন সবচেয়ে গুরুত্বহীন প্রশ্ন ছিলো এটা। কিন্তু এখন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি নতুন প্রজন্মকে বোঝানোর চেষ্টা করবো, মুক্তিযুদ্ধটাকে যেন সঠিক গুরুত্ব দিয়ে তারা অনুভব করার চেষ্টা করে। এক সময় এটা পাকিস্তান নামে একটা দেশ ছিলো, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান। আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তান মূলত তাদের মিলিটারি শাসন দিয়ে এই গোটা দেশটাকে শোষণ করতো। আইয়ুব খান নামে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, যারা নতুন প্রজন্ম তারা চিনবে না। তিনি খুব কঠিনভাবে দেশ শাসন করেছেন। ১৯৬৯ সালে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গাতে মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানকে সেখান থেকে দূর করে দেয়া হয়। আইয়ুব খান যাবার আগে ক্ষমতা যাকে দিয়ে গেলেন তার নাম ইয়াহিয়া খান। তাকে জ্যোতিষী বলেছিলো ২৫ মার্চ তার জন্য খুব ভালো দিন। কথাটা সত্য প্রমাণ করার জন্যই ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খান থেকে ক্ষমতা পেয়ে ঘোষণা করলো, এই দেশটাকে একটা গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করবে। এখানে প্রথমবারের মতো একজন মানুষ একটা ভোট দিয়ে একটা নির্বাচন করে একটা গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হবে। ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে এ দেশে প্রথমবারের মতো রাজনীতি শুরু হলো অবশ্য এর আগে থেকেই আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাচ্ছিলেন ছয় দফা নিয়ে। তিনি সবাইকে দেখালেন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র হয়েছে সে রাষ্ট্রটি হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান অংশটি পাকিস্তান থেকে কিছু পায়নি। শুধু শোষণের শিকার হয়েছে। ঠিক এর আগে ১৯৭০ সালের ১২ নবেম্বর এখানে একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছিলো। এরকম ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে কখনো হয় নাই, মানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। কত মানুষ সেখানে মারা গিয়েছিলো তার কোনো হিসাব নেই। সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের পর প্রথম কয়েক দিন এমন অবস্থা ছিল যে মানুষ ঠিক জানতেও পারেনি কি হয়েছে। ধীরে ধীরে যোগাযোগ হয়েছে, মানুষ জানতে পেরেছে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। তখন পাকিস্তানের

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গিয়েছিলো চীনে। সে চীন থেকে ফেরার পথে সেখানে নামার প্রয়োজন মনে করে নাই, চলে গিয়েছে পাকিস্তানে। অথচ ঘূর্ণিঝড়ে কয়েক লাখ মানুষ মারা গেয়েছে, বাংলা মানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে এই ভয়ংকর অবস্থাটা দেখার মতো মানসিকতাটা তার ছিল না। এই ঘটনাটি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো তোমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষজন কিংবা জেনারেলরা কিংবা সামরিক বাহিনী কিন্তু ঠিক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না। যখন খুব হৈ চৈ শুরু হলো, ইয়াহিয়া খান এসেছিলো কিন্তু সেখানে এলে মানুষজনের ধিক্কার ছাড়া তার ভাগ্যে কিছু জোটেনি।

আমাদের সেই তৎকালীন পাকিস্তানে দেশটা কারা শাসন করতো, ভিতরে কি হতো তার উপরে খুব চমৎকার একটা বই আছে। বইটার নাম হলো ‘দ্য আলটিমেট ক্রাইম’, লেখক হলেন সরদার মোহাম্মদ চৌধুরী। যাদের আগ্রহ আছে বইটা পড়তে বলবো, তবে যাদের বয়স কম তাদের না পড়াই ভালো। সেখানে ইয়াহিয়া খানের ব্যক্তিগত কাজ কর্মের কথা আছে যা এত অশালীন এত বাজে এত অশ্লীল এত জঘন্য যেটা পড়লে তাদের খুব খারাপ লাগবে। সেজন্য যারা কম বয়সী তাদের পড়তে বলব না। যারা বয়স্ক মানুষ তারা পড়তে পারেন দেখার জন্য যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানসিকতাটা কিরকম এবং তারা কিভাবে দেশ শাসন করে।

তবে সবচেয়ে বড় কথা, যখন তারা বলল নির্বাচন দেবে তখন তারা কিন্তু ধরেই নিয়েছে আসলে রাজনীতিবিদরা দেশ চালাতে পারে না। এই নির্বাচনে কেউই নিরঙ্কুশভাবে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। বিভিন্ন দলের সদস্য অল্প কটা সিট পাবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে থাকবে, খোয়াখুয়ি করতে থাকবে, কাজেই তাদেরকে ক্ষমতা দিতে হবে না। তখন আর্মি একদম জাস্টিফাইডভাবে বলবে, রাজনীতিবিদরা দেশ চালাতে পারে না, আমরা দেশ চালাবো। একদম পরিষ্কার এই ছিল প্ল্যান। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হলো, সেই নির্বাচনে দেখা গেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সিট পেয়েছে ১৬০টি, ১৬২টার ভেতরে দুটো সিট শুধু মিস গেয়েছে। আমার মনে হয় না পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এ ধরনের কিছু দেখা গেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো পেয়েছে ৮০টার মতো সিট। বাকিগুলো সবাই ভাগাভাগি করে পেয়েছে। আমার ধারণা যে, ঠিক সেই মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশের জন্ম হয়ে গিয়েছিলো। তখনই পাকিস্তান আর্মি বুঝে গেয়েছে যে যাদের পরিকল্পনা খুব খারাপভাবে ব্যাকফায়ার করেছে। তারা ধরে নিয়েছিলো কোনো রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। এখন পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন এবং সরকার গঠন করবেন। বিরোধীদল থাকবে ভুট্টো তার পিপলস পার্টি ও অন্যান্যদের নিয়ে। রাজনীতি যারা করে তারা জানে, দুটো দল থাকে। একটা দল ক্ষমতায় যায় আরেকটা বিরোধীদল থাকে। একদম পরিষ্কার গণতান্ত্রিকভাবে যাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে সুদৃঢ় কাঠামো। কিন্তু সেটা তো হতে দেওয়া যাবে না, কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না। তখন ষড়যন্ত্র শুরু হলো, সেই ষড়যন্ত্রে ভুট্টো অংশ নিলো।

> **আমাদের দেশে নতুন প্রজন্মকে যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলতে হয় তারা একটা প্রশ্ন করে যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো? তাদের সমস্ত কিছু এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো। আজকে আমার বক্তব্য দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যখন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো তখন সবচেয়ে গুরুত্বহীন প্রশ্ন ছিলো এটা**

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ ছিল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিল, জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচন্ড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। যে ধরনের বিক্ষোভ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি দেখা যায় না। মার্চ মাসের ১ তারিখ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করলেন, তার কোনো তুলনা নেই। একটা পুরো দেশ তখন একজন মানুষের কথায় চলছে। মার্চের ১ তারিখ থেকে শুরু হলো এবং চলতে থাকল। যারা ইতিহাস পড়েছে তারা জানে, ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাদের বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মার্চের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু খুব সুন্দর একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণ। আমরা যারা তখন ছিলাম তারা শুনেছি এবং সেই ভাষণ এতো সুন্দর! এমন কোনো কাগজে লেখা ছিল না। ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সেখানে কত লক্ষ মানুষ ছিলো তাদের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণটি আমার মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো সুন্দর ভাষণ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি। আমাদের বয়সী যারা আমি নিশ্চিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে মোটামুটিভাবে ভাষণটা মুখস্থ বলে দিতে পারবে। ‘আর যদি একটা গুলি চলে। আর যদি আমার লোকদের ওপর হত্যা করা হয়, ভাইয়েরা আমার, তোমাদের...।’ আমাদের মুখস্থ জিনিসগুলো, ভাষার ভেতরে অনেক জায়গায় অ্যানালাইলিস করে দেখা যাবে হয়তো বাংলাটা শুদ্ধ না। ভাষণের শেষ যেটা ছিলো, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ বলা যেতে পারে আমাদের বাংলাদেশ যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে তখনই সেটা নির্ধারিত হয়ে গেল।

মার্চের ২ তারিখের দিকে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি হয়েছিলো, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। একটা সবুজ পতাকার মাঝখানে লাল সূর্য তার মাঝে সোনালি রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। সমস্ত বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সেই পতাকা উড়ল। সেটা মার্চ মাসের ২৩ তারিখ, বঙ্গবন্ধুও নিজের বাসায় সেই পতাকা তুলেছিলেন ২৩ মার্চ। আমরা সবাই জানি আমরা নতুন একটা দেশ পাচ্ছি। পাকিস্তান নামক দেশটার সঙ্গে আমরা থাকার চেষ্টা করেছিলাম যেটা কাজ করছে না। সেই দেশটা কখনোই আমাদেরকে নিজেদের অধিকার নিতে দেবে না, কাজেই আমরা একটা নতুন দেশ পেতে যাচ্ছি। সবাই আমরা জানতাম। ব্যাপারটা কিভাবে হবে সেটা নিয়ে শুধু কৌতূহল। আমরা মার্চের ১৪-১৫ তারিখের দিকে চলে গেলাম পিরোজপুরে। মার্চের ২৫ তারিখে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ গভীর রাতে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। একজন মানুষ মাইকে ঘোষণা করছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের উপরে আক্রমণ করেছে। তারা গণহত্যা শুরু করেছে। সেই গভীর রাতে ঘোষণাটা কি ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্কের ঘোষণা সেটা যারা না শুনেছে তারা বুঝতে পারবে না। আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। আমরা ছুটে গেলাম কাছাকাছি থানাতে। প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে একটা ওয়্যারলেস থাকে। ওয়্যারলেসটা অন করা হয়েছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অপারেটর কথা বলছে। ‘পাকিস্তান মিলিটারি আমাদেরকে আক্রমণ করেছে, আমাদের

পুলিশ ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমরা যুদ্ধে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমাদের অসংখ্য পুলিশ মারা গিয়েছে'। পিছনে গুলির শব্দ, মেশিনগানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই গভীর রাতে আমরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তখন সবাই বুঝতে পেরেছিলাম, আসলে বাংলাদেশের কি হবে না হবে সেই শেষ জিনিসটি আসলে নির্ধারিত হয়ে গেছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে।

তখন যে পুলিশেরা যুদ্ধ করেছিলো তারা কেউ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেনি। তারা কেউ বলে নাই আগে ঘোষণাটা আসুক তারপর আমি যুদ্ধ করব। আসলে যখন আক্রমণ করেছে তারা যুদ্ধ শুরু করেছে। পুলিশ বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য ট্রেইনডও না, তাদের অস্ত্রও নেই সেরকম। তারপরও তারা সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে। পিলখানায় যুদ্ধ করেছে বিডিআররা।

এবং সেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় আমাদের কাছে মনে হয় এটা হঠাৎ করে হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেটা হঠাৎ করে করে নাই। তারা দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করেছে। তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল, যার নাম 'অপারেশন সার্চলাইট'। আমি সবাইকে বলব যেন সেই 'অপারেশন সার্চলাইট'টা একবার পড়ে। এখানে লেখা আছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিভাবে চিন্তাভাবনা করে, সেটা দেখার জন্য। আমি দু-একটা লাইন একটু পড়ে শোনাই। আমার কাছে যে বইটা আছে সেটা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন লোকের লেখা। একটা জায়গায় লেখা আছে 'সারপ্রাইজ এন্ড ডিসেপশন। সারপ্রাইজ মানে অবাক, আশ্চর্য করে দেয়া আর ডিসপেশন মানে প্রতারণা। ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে কিভাবে প্রতারণা করে সেটা লেখা আছে: At higher plane, it is requested that the President may consider the desirability of continuing the dialogue-even of deceiving Mujib that even though Mr. Bhutto may not agree he will make an announcement of 25 March conceding to the demands of A. L. etc. তার মানে, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে এবং এমন ভাব করবে যে যদিও ভুট্টো রাজি নন তারপরও ২৫ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দিবেন'। পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছে কিভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতারণা করবে। আমি সবাইকে বলব যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে চান তারা যেন বইটা পড়েন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ২৫ মার্চের রাত থেকেই। যখন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয় এবং নতুন প্রজন্ম জিজ্ঞাসা করে ঘোষণাটা কে দিয়েছিল আমাকে সেটা একটু কষ্ট দেয়। কে ঘোষণাটা দিয়েছিল এটা নিয়ে ভীষণ বিতর্ক আছে। আমি ঘোষণাটার ব্যাপারেও এই বই থেকে দুটো লাইন পড়ে শোনাই। এটা একজন পাকিস্তানি সাংবাদিকের মানে বাইরের একজন লোকের লেখা। যে ভদ্রলোক লিখেছেন উনি আওয়ামী লীগও করেন না, বিএনপিও করেন না, তার লেখাটাই আমি পড়ে শোনাই. Thus the action had started before schedule. There was no point now in sticking to the prescribed H-hour. The gates of hell had been cast open. When the first shot had been fired, 'the voice of Sheikh Mujibur Rehman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh procliamed East Pakistan to be the People's Republic of Bangla Desh Documents released by the Indian Foreign Ministry. It said, 'This may be my last message. From today Bangla Desh is independent. I call upon the people of Bangla Desh, wherever you are and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangla Desh and final victory is achieved.' এটা ২৫ মার্চের রাতে যখন এ্যাটাক হয়েছে তার বর্ণনা। 'অপারেশন সার্চলাইট নির্ধারিত সময়ের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন ঠিক সময়ে শুরু করার কোনো মানে হয় না। শুরু যখন হয়ে গিয়েছে শুরু হয়ে যাক। দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। যখন প্রথম গুলিটা শুরু হয়েছিল তখন শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর, তারা তো বঙ্গবন্ধু বলত না শেখ মুজিব বলত, পাকিস্তান রেডিওর খুব কাছাকাছি ওয়েভলেন্থ থেকে শোনা গিয়েছিল।

যেটা শুনে মনে হয়েছিল আগে থেকে রেকর্ড করা একটা মেসেজ তখন বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে সে পূর্ব পাকিস্তানকে পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ বলে ঘোষণা দিয়েছিল। পুরো জিনিসটাই ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ নথিপত্রতে আছে। এটা হচ্ছে আমার সর্বশেষ মেসেজ আজকে থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমাদের কাছে যা আছে সেটা নিয়েই তোমরা এই আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশেষ পাকিস্তানী সেনাকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বের করে দেয়া হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ততক্ষণ তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে'। এটা হচ্ছে সিদ্দিক সালিকের বইয়ে লেখা ঘটনা একটা। ২৭ মার্চ যুদ্ধ যখন চলছে আমরা কেউ এটা শুনিনি। এই ঘোষণাটা আমরা শুনিনি। কারণ আর্মির লোকেরাই পড়ছে তারাই এটা রেকর্ড করেছে। আমরা সাধারণ মানুষের কিন্তু ২৭ মার্চ খুব পরিষ্কারভাবে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের ভাষণটা শুনেছিলাম। শুনে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সে যুদ্ধে শুধুই সাধারণ ছাত্র-জনতা মানুষ নয়। আমাদের সেনাবাহিনীতে একজন মেজর এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছেন সেটা আমাদের অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল। সেও বলেছে সে ঘোষণাটা শুনেছিলো। যখন আমাকে নতুন প্রজন্মের সবাই জিজ্ঞাসা করে ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো। আমি কখনও বলিনা কে ঘোষণাটা দিয়েছিলেন। আমি সবসময় নতুন প্রজন্মকে বলি তোমাদের যদি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কৌতূহল থাকে তোমরা নিজেরা বের করে নাও। তোমরা বইগুলো পড়।

আমি সবাইকে বলব যেন সেই 'অপারেশন সার্চলাইট'টা একবার পড়ে। এখানে লেখা আছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিভাবে চিন্তাভাবনা করে, সেটা দেখার জন্য

আমি তাদেরকে চারটা বই পড়তে বলি। প্রথম যে বইটা আমি পড়তে বলি সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাদের সবার প্রিয় শহীদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলো। যেহেতু জাহানারা ইমামের লেখার ক্ষমতা অসাধারণ তিনি প্রায় ব্যক্তিগত ডায়রির মতো করে একটা একটা দিন করে কাহিনীটা লিখেছেন। কেউ যদি বইটা পড়ে ঠিক আজ থেকে প্রায় ৩০-৩৫ বছর আগে যখন ১৯৭১ সাল ছিল, সেই দিনগুলো যেভাবে কেটেছিল, সেই ঘটনাগুলো জানতে পারবে। তাঁর ছেলে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছে, স্বামীকে তিনি হারিয়েছেন। অত্যন্ত ক্ষমতা দিয়ে তিনি বইটা লিখেছেন। কাজেই নতুন প্রজন্ম যদি একাত্তরের দিনগুলো বইটি পড়ে মুক্তিযুদ্ধ কি ছিল তার একটা অনুভূতি তারা পেতে পারে।

দ্বিতীয় আমি একটা বই পড়তে বলি, বইটির নাম 'জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা' বইটি লিখেছেন মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়া। আমি তাকে কখনও চিনতাম না। আমি বইটি

একদিন, ট্রেনে আসতে আসতে পড়ছি। একটা করে গল্প পড়ি আর দেখি আমার চোখে পানি এসে যায়। একজন বয়স্ক মানুষের যদি বই পড়ে চোখে পানি এসে যায় সেটা একটু লজ্জার ব্যাপার। কাজেই আমি করি কি, ট্রেন থেকে জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে রাখি। চশমাটা খুলি, যেন বাতাসে চোখটা শুকিয়ে যায়। তারপর আরেকটা গল্প পড়ি। এই অসাধারণ বইটি হল মুক্তিযুদ্ধের গল্প যারা এ্যাকচুয়ালি মাঠে-ঘাটে যুদ্ধ করেছে তাদের গল্প, তাদের কাহিনী। মেজর কামরুল হাসান সেটাকে বলেছেন 'জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা'। আমার মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে জনযুদ্ধ। তারমানে এই যুদ্ধটা করেছিল দেশের সাধারণ মানুষজন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ, তাঁতী-মজুর, সেনাবাহিনীর লোক, ছাত্র সবাই সেখানে যুদ্ধ করেছে। একটা গণযুদ্ধ ছিল এখানে।

তৃতীয় যে বই আমি পড়তে বলি, সেটা হলো সিমিন হোসেন রিমির বইটি। বইয়ের নাম হলো '১৯৭১ সাল এবং আমার বাবা তাজউদ্দিন আহমেদ'। বইটি পড়বে এইজন্য যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা মুক্তিযোদ্ধা, তারা সরাসরি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে। আর যারা এখানে আটকা পড়ে আছে তারা কিন্তু খুব উদ্বিগ্ন ছিল। আর প্রায় ১ কোটি মানুষ তখন ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে শত্রুরা তাড়া করছে তার মধ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে। এই সেন্সটা আসলে পাওয়া খুব দরকার যে মানুষ কত কষ্টে ছিল। এবং এই দেশের জন্য যার বাবা তাজউদ্দিন আহমেদ এই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন তাঁর কন্যা বাংলাদেশের ভিতর আটকা পড়ে আছে এবং অন্যান্য ভাই- বোন, স্ত্রী। তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যান নাই। তারা নিজেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালিয়ে কোনোভাবে তার বাবার সঙ্গে হাজির হবার চেষ্টা করছে। এবং সেখানে যাবার পর তার বাবা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য আলাদাভাবে আছেন, তারা আলাদাভাবে আছে। এই যে ত্যাগ, যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে তারা আলাদা আছেন। এত অসাধারণ মুক্তিযুদ্ধের দলিল আমার মনে হয় আর নেই।

যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা হাতে অস্ত্র নিয়ে ভয়ঙ্কর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। একদিক দিয়ে তারা ছিলেন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর যারা আটকা পড়েছিলো তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। তাদেরকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই

আমি সর্বশেষ বই পড়তে বলি 'উইটনেস টু সারেন্ডার' সিদ্দিক সালিকের লেখা বই। কারণ এটা একজন পাকিস্তানির লেখা বই। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের বলে দুষ্কৃতিকারী, যারা বঙ্গবন্ধুকে বলে শেখ কিংবা শেখ মুজিব। তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। সমস্ত ব্যাপারটিতে দেখানোর চেষ্টা করে জিনিসটা আসলে তাদের পক্ষে হয়েছিল, আমাদের পক্ষে হয় নাই। কিন্তু সেই বইটির ভিতরেও তাদেরকে স্বীকার করতে হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যখন ধরে নিয়ে আসে গুলি করার জন্য সে শেষবারের মতো তার মাটিকে চুমু খেয়ে বলে, 'তুমি আমাকে মার'। মুক্তিযোদ্ধাদের এই বিশাল আত্মত্যাগের কথা এই পাকিস্তানি মেজরের স্বীকার করতে হয়েছে। সেজন্য আমাকে যখন নতুন প্রজন্মের কেউ জিজ্ঞাসা করে ঘোষণাটি কে দিয়েছিল, আমি মনে একটু কষ্ট পাই। ১৯৭১ সালে কে ঘোষণা দিয়েছিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কাজেই এখন কেন হঠাৎ করে এটা এতো গুরুত্বপূর্ণ হবে। ১৯৭১ সালে সবাই ধরে নিয়েছিল আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে এবং সবাই মিলে এক সঙ্গে সেই যুদ্ধ করেছিলো। তারপর ২৫ মার্চ থেকে যে যুদ্ধ শুরু হলো সে যুদ্ধটি আমাদের সবার ধারণা ছিল আগামী ৫ বছর, ৬ বছর হয়তো ১০ বছর লাগবে দেশ স্বাধীন হতে। আমরা কেউ একবারও কল্পনা করিনি মাত্র ৯ মাসের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

প্রথম দিকে যুদ্ধটা হয়েছিল ছাড়া ছাড়া। কারণ সবাই ঠিক প্রস্তুত ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ হয়েছিল। আস্তে আস্তে পরিকল্পনা মতো যুদ্ধটি শুরু হয়। খুব ধীরে ধীরে বোঝা যায়, প্রায় জুলাই মাসের দিকে মোটামুটিভাবে বোঝা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই বাংলাদেশের মাটিতে থাকতে পারবে না। তাদের চলে যেতে হবে। এই কথা কেউ চিন্তা করেনি, কিছুদিনের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

আমার আজকের আলোচনার ভিতর ৩টা জিনিস দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ, একটা নতুন প্রজন্ম, আরেকটা ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। এর যে কোনো একটা বিষয় নিয়েই দীর্ঘ সময় কথা বলা সম্ভব। সে চেষ্টা না করে যেহেতু নতুন প্রজন্ম কথাটা আছে, আমি নতুন প্রজন্মের সঙ্গেই দুয়েকটা কথা বলি। আমি যেহেতু ছোট বাচ্চাদের জন্য লেখালেখি করি, আমার কাছে প্রায়ই তারা চিঠি লেখে। তাদের একটা বড় অংশ আমাকে বলে তারা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব কৌতূহলী নয়। তারা আমাকে লেখে, যখন তারা দেখে নতুন প্রজন্মের একটা অংশেরা বাংলাদেশ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না হয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে বিরোধী শক্তি ছিলো তাদের জন্য খানিকটা মানবতা রয়েছে। জিনিসটা তারা বুঝতে পারে না। আমাকে চিঠি লিখে যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ ঘটেছিল, সে দেশে এটা কেমন করে সম্ভব।

আমার এক বন্ধু ছিলো, নাম স্টিভ। সে আমেরিকায় থাকে। আমি যখন আমেরিকায় থাকি সে বাংলাদেশে এসেছিলো ১৯৭৭ বা '৭৮ সালের দিকে। এখান থেকে ঘুরে যখন ফিরে গিয়ে আমাকে বলেছে, দেখ, তোমাদের দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে অত্যাচার করেছিলো আজ থেকে ২০ বা ৩০ বছর পরে পৃথিবীর কেউ সেই কথাটা বিশ্বাস করবে না। কারণ, এ ধরনের ভয়ঙ্কর অত্যাচার, একটা জাতির ওপর করা সম্ভব এত অমানবিক একটা ব্যাপার ঘটা সম্ভব সেটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কেউ সেটা বিশ্বাস করবে না। আমি তার কথা বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু এখন আমার মনে হয় সে সত্যি কথাই বলেছিলো। এখন একটা নতুন প্রজন্ম এসেছে। তারা জানে না অনেক সময় তারা সেটা বিশ্বাসও করতে চায় না, আমাদের এই দেশের ওপর কি ভয়ঙ্কর একটা অত্যাচার করা হয়েছিলো। যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা হাতে অস্ত্র নিয়ে ভয়ঙ্কর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। একদিক দিয়ে তারা ছিলেন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর যারা আটকা পড়েছিলো তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। তাদেরকে যে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। আমার মনে আছে, একটা গ্রামে দাঁড়িয়েছিলাম আমার এক নানা বাড়িতে। হঠাৎ করে দেখলাম কতগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। আমার আত্মীয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ করে একজন মানুষ ছুটতে ছুটতে আমার পাশে এসে দাঁড়াল এবং কাঁদতে শুরু করলো। মানুষটির স্ত্রী ওই ঘরে আটকা পড়ে আছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা তার স্ত্রীকে সেখানে ধর্ষণ করছে। তার স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদছে। আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার পাশে তার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে এবং সেও শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে আমার নিজের দেখা ঘটনা। এই এক আশ্চর্য ঘটনার মতো এ দেশে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে।

কিছুদিন আগে একটা বই বেরিয়েছে, নাম 'তালাক'। বইটি লিখেছেন শাহীন আখতার এবং 'প্রথম আলো' তাকে বছরের

সেরা সাহিত্যকর্ম হিসেবে পুরস্কার দিয়েছে। আমি বইটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি এবং মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা এটি প্রথম সত্যিকারের একটা সাহিত্যকীর্তি। বইটি লেখা হয়েছে আমাদের দেশের নির্যাতিত মেয়েদেরকে নিয়ে। শাহীন আখতারের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি, পরিচয় হয়নি। আমি ইনফ্যাক্ট পরিচয় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি অত্যন্ত মমতা নিয়ে বইটি লিখেছেন এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত মহিলারা কি কষ্টে ছিলেন তার খুঁটিনাটি জানেন। বইটি পড়লে আমাদের দেশে কি হয়েছিল সেটার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এতো বড় নির্যাতন এই দেশে ঘটেছিলো এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সেই নির্যাতন মাথা গুঁজে সহ্য করেননি। তারা পাল্টা যুদ্ধ করে আঘাত দিয়েছিলেন।

যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে দেখার চেষ্টা করে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে এটা আসলে আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা করেনি। এটা ভারতীয় সেনাবাহিনী করে দিয়েছে। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো, ভারতীয় সেনাবাহিনীদের লেখা কিছু বই পড়তে। আমি নিজে মিলিটারি মানুষ নই, যোদ্ধা মানুষ নই তারপরও আমি জানি একটা দেশ যখন পাল্টা আক্রমণ করতে হয়, সৈন্যের একটা ভারসাম্য থাকতে হয়। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষ অংশটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী অত্যন্ত কম সেনাবাহিনী নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধটা শুরু করেছিলো আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবং বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলো। ভারতের সেনাবাহিনী সাহায্য করার কারণে এই যুদ্ধটি নয় মাস পর সমাপ্ত হয়েছিলো। যদি ভারতের সেনাবাহিনী সাহায্য না করতো আমাদের সময় হয়তো বেশি লাগতো, কিন্তু এ দেশে যে স্বাধীনতা আসতো এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই।

এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমি নতুন প্রজন্মকে বলবো, তাদেরকে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে এবং ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তারা গড়ে তুলতে পারবে তখনই, যখন সত্যিকার অর্থে নিজের দেশকে ভালোবাসবে এবং নিজের দেশকে তারা তখনই ভালোবাসবে যখন তারা নিজের দেশের ইতিহাস জানবে। মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়ার বইটা আমার কাছে আছে। আমার খুব প্রিয় বই। আমি সবাইকে পড়তে বলবো। সেখান থেকে আমি ছোট একটা গল্প পড়ে শোনাই।

এই গল্পের নাম হচ্ছে 'তাগড়া'। তাগড়া মানে হচ্ছে বড়সড়, মোটাসোটা। যিনি গল্পটা লিখেছেন তিনি তাগড়া নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার বর্ণনা দিয়েছেন। সে অত্যন্ত শক্তিশালী, মোটাসোটা, বড়সড়। যুদ্ধের একটা ঘটনার বর্ণনা আছে। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধারা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামনাসামনি জায়গায় ট্রেঞ্চ খুলে বাংকারের ভেতর অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ আটকে গিয়েছে, কোনোদিকে অগ্রসর হচ্ছে না। সেখান থেকে শুরু হচ্ছে ঘটনাটা। 'অপেক্ষার অবসান টানল শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থানের এক বিশালদেহী সৈনিক। এসএমজির ব্যারেল ডান হাতে এবং স্টক বাঁট বাম হাতে উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে গেল। সাঈদদের প্রতিরক্ষা থেকে কেউই গুলি করলো না। ন'মাসের ক্লান্তিকর যুদ্ধ বোধ করি একে বিরক্তির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো: 'হ্যায় কোই মা কি লাল? মা কি দুধ পিয়া হো তো বেগায়ার হাতিয়ারকে সামনে আ যাও'। (আছে কোনো মায়ের ছেলে, মার দুধ যদি পান করে থাক তাহলে বিনা অস্ত্রে সামনে এগিয়ে এসো)'। অর্থাৎ যুদ্ধের এই পর্যায়ে একজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লাফ দিয়ে উপরে উঠেছে, সে চ্যালেঞ্জ করছে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যে তোমাদের ভেতর কি কেউ আছে যে খালিহাতে যুদ্ধ করার জন্য। যদি থাক তো সামনে এগিয়ে আসো। 'কথা শেষ করে সবার সামনে এসএমজিটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর একটানে ইউনিফর্মের শার্টের বোতাম ছিঁড়ে গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আরেক দিকে। আমাদের ছেলেরা অবাক হয়ে দেখছে এক পাগল সৈনিকের কান্ড। এবার সে এক পা-দু'পা করে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানের দিকে আগাতে লাগলো। লুঙ্গি পরা উদাম দেহের তাগড়া সইতে পারলো না। তার দেশে হানাদার শত্রু দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে বিনাযুদ্ধে চলে যাবে? হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির খোটা গুঁজতে গুঁজতে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো মরদো (লোকটা) মনে হরছে কি? বাঙালিগো মধ্যে কেউ কি নাই যে অর লগে বুঝাদে পারে? মেবাই (মিয়াভাই) তাগড়ারে আর ধইরা রাখতে পারলেন না। হালার পো হালায়ে বে-জাগার হাত দেছে'। 'জয় বাংলা বলে তাগড়া শত্রুর সৈন্যটির দিকে এগুতে লাগলো।' এখানে আরেকটা কথা, জয় বাংলা স্লোগানটা এখন অত্যন্তভাবে আওয়ামী লীগের স্লোগান। কেউ যদি জয় বাংলা বলে, ধরে নেয়া হয় সে আওয়ামী লীগ করে। ১৯৭১ সালে কিন্তু 'জয় বাংলা'টা আওয়ামী লীগের স্লোগান ছিল না। এটা ছিল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের স্লোগান। স্লোগানের সাধারণত একটা সামনে-পিছে থাকে। 'টিক্কা খানের চামড়া তুলে নেব আমরা এ রকম হয়। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা'। কিন্তু জয় বাংলা স্লোগান একটা পিকুলিয়ার স্লোগান ছিল। আগে পিছে কিছু নাই। 'জয় বাংলা' বলে শেষ। স্লোগানের ব্যাকরণ মানে নাই একটা স্লোগান, মুক্তিযুদ্ধের সময় কি ভয়ঙ্কর ভূমিকা পালন করেছিল সেটা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। শুধু 'জয় বাংলা' কথাটা উচ্চারণ করার জন্য এ দেশে কত অসংখ্য শিশু-কিশোর-তরুণ যে গুলি খেয়ে মারা গেছে সেটা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না। যাই হোক আরেকটু অংশ পড়ি, 'আমাদের সবাই নির্বাক। মোদের শত্রু, দু'পক্ষের যেন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার একটা মৌন সমর্থন ছিলো। দু'জনেই এগুতে এগুতে সামনাসামনি হলো। আধুনিক যুদ্ধে মধ্যযুগীয় যুদ্ধের মহড়া। এটা কি যুদ্ধের নাটক, নাকি নাটকের যুদ্ধ। কয়েক সেকেন্ড দু'জনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। এবার তাগড়া তার ডান হাতে খোলা আঙ্গুলে সজোরে থাবা বসিয়ে দিলো শত্রুর সৈনিকের বাম বুকে। প্রচন্ড থাবার ভরবেগে শত্রুসৈনিক পিছিয়ে পড়তে পড়তেও দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারলো। তাগড়াও পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে হয়েছে ৪.৫ গজ। তারা সামনাসামনি এরা যুদ্ধ করতে চলবে।' এমন সময় শত্রুর প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কয়েকটি গুলি এসে তাগড়াকে ঝাঁঝরা করে দিল। তাগড়া বুকের ওপর ভর করে পড়ে গিয়ে আর একটুও নড়তে পারেনি। শত্রু সৈনিক লাফিয়ে গিয়ে পড়লো তার প্রতিরক্ষা অবস্থানে। আমাদের ছেলেদের তখন মাথায় রক্ত উঠে গেছে। সাইদ তার সিগনাল পিস্তল থেকে পরপর দুটি লাল ছুড়ল। মুহূর্তেই নিরস্ত্র এলাকাবাসীসহ সম্মুখ আক্রমণে দখল করা হলো শত্রুর অবস্থান। প্রতিদ্বন্দ আহ্বানকারীরা সৈনিকটি মরে পড়ে আছে গায়ে ৫-৬টি জায়গায় গুলির আঘাত নিয়ে। ১০০র বেশি শত্রুর মধ্যে ৫ জনকে মাত্র জীবিত পাওয়া গেল, আর সবাই মৃত। যুদ্ধবন্দি সৈন্যরা জানালো যে তাগড়ার ওপর গুলি করার পর

শাহীন আখতারের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি, পরিচয় হয়নি। আমি ইনফ্যাক্ট পরিচয় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি অত্যন্ত মমতা নিয়ে বইটি লিখেছেন এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত মহিলারা কি কষ্টে ছিলেন তার খুঁটিনাটি জানেন

সৈনিকটি ফিরে এসে একটি এসএমজি নিয়ে নিজেদের সব সৈনিককে গুলি করে হত্যা করেছে। আর অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে কাপুরুষের মত তাগড়াকে গুলি করার জন্য।' অসংখ্য গল্প থেকে এই একটা গল্প আমি বেছে নিলাম বলার জন্য যে সেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকটা ফিরে গিয়ে তার দলের সবাইকে গুলি করে হত্যা করেছে এই বলে তোমরা এতো কাপুরুষ কেন? আমি যুদ্ধে গিয়েছি আমার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য মানুষটি খালি হাতে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাকে তোমরা মেরে ফেললে। এতো বড় কাপুরুষোচিত কাজের জন্য হত্যা করেছে।

যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছেন তাদের কাছে এ ধরনের অসংখ্য, লক্ষ লক্ষ ঘটনা আছে। আমি নতুন প্রজন্মকে অনুরোধ করবো যদি কখনো তারা একজনকে খুঁজে পান তার কাছে গল্প শুনতে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এ ধরনের ত্যাগ কতো ঘটেছে তার কোনো সীমা নেই। আর নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সেই আসল, সত্যিকার জিনিসটি ছেড়ে দিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করে ঘোষণাটা কে দিয়েছিলো, আমার প্রচন্ড কষ্ট হয়। ঘোষণা কে দিয়েছিলো সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

আজকের আলোচনার একটা অংশ 'ভবিষ্যতের বাংলাদেশ'। সব সময়ই বলি আমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বলতে সেই বাংলাদেশকে বোঝাই যার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, কারণ এই দেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হবে। দেশে প্রত্যেকটা মানুষ সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবে। দেশের মানুষ হবে শোষণহীন। এ ছিল আমাদের ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ, এখনো যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি এখনো একই কথা বলবো। আমাদের দেশটা হবে শোষণহীন দেশ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

আমরা ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বলতে সেই বাংলাদেশকে বোঝাই যার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো, কারণ এই দেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হবে

এখন আমরা দেখছি, আমাদের দেশ অত্যন্ত ঘোরতর একটা সাম্প্রদায়িক দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হয়। আমি দেখতে পাই শিক্ষক নেয়ার জন্য তাদের ভেতরে কারো যদি বাংলা নাম থাকে অর্থাৎ হিন্দু হয় তাকে না নেয়ার জন্য আমাদের শিক্ষকদের বোর্ড প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। একটা সময় ছিলো যখন জিনিসটা করতো ট্যাক্টফুলি, যাতে বুঝতে না পারে। এখন আর ট্যাক্টফুলি করা হয় না। পরিষ্কার করে ঘোষণা দিয়ে জিনিসটা করা হয়। এ বাংলাদেশ আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। যেখানে ধর্ম, গায়ের রঙ, সে বাঙালি, সাঁওতাল, মগ, মুরং, নাকি চাকমা কিছু আসে-যায় না। যারা এ ভূখন্ডে থাকে তাদের সমান অধিকার। আমার মনে হয় আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ জিনিসটা বুঝতে হবে একজন মানুষের ধর্ম কি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো না কোনোভাবে নতুন প্রজন্মকে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে ধর্মটাকে ব্যবহার করতে, তাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের ধর্মটিই শ্রেষ্ঠ। অন্যদের অবহেলা করতে হয়। আমি নতুন প্রজন্মকে অনুরোধ করবো, তারা যেন সেখান থেকে বের হয়ে আসে।

পৃথিবীর কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এ বয়সে পৌঁছেছ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কি শিখেছ? একটা জিনিসই বলবো, আমি শিখেছি পৃথিবীর সৌন্দর্য, হচ্ছে বৈচিত্র্য। একজন মানুষ মুসলমান, পাশে আরেকজন হিন্দু, আরেকজন বৌদ্ধ, আরেকজন খ্রিষ্টান- এ যে বৈচিত্র্যটা আছে সেটাই আসলে পৃথিবীর সৌন্দর্য। যেহেতু মুসলমান অবশ্যই আমি ধর্মকে ভালোবাসি। ধর্মের সব কিছু পালন করবো। তার মানে এই না আমি অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবো। কিন্তু এখন সেটাই হচ্ছে। এখন আমাদের দেশে ধর্ম অনেকটা ফুটবল খেলার টিমের মতো, ক্রিকেট টিমের মতো। দেখা যাক কারটা ভালো, ভাই আমারটা ভালো, আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়ে জায়গায় ভালো করবো, সেটার জন্য ধর্ম তৈরি হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ধর্মকে ভালোবাসবো কিন্তু আমার পাশাপাশি অন্য ধর্মকে যদি আমি শ্রদ্ধা করতে না পারি তাহলে আমার ধর্মের কোনো মূল্য নেই। এটা অত্যন্ত সহজ জিনিস। জিনিসটি মনীষীরা সেই কতো সহস্র বছর থেকে বলে আসছেন। কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, আমাদের স্বাধীনতার ৩০ বছরের ভেতর সেই জিনিসটি পাল্টে গেছে। এখন ধর্মটাকে ব্যবহার করা হয় সমস্ত ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িকতাকে এখান থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে।

ছোট বাচ্চারা আমাকে চিঠি লেখে, তারা অনেকেই আমাকে বলে, আমরা যখন দেশের কথা বলি অনেকেই সেটা নিয়ে হাসাহাসি করে। তারা বলে যে এ দেশ এতো খারাপ, দুর্নীতি, এটা-সেটা। আমি পাস করে দেশের বাইরে চলে যাবো। আর কোনোদিন ফিরে আসবো না। দেশের জন্য আমার কোনো মমতা নেই। তারা কষ্ট পায়। চিঠি লিখে কষ্টটা জানায়। আমি জানি তাদের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা, দেশের জন্য তাদের ভেতর গভীর মমতা রয়েছে। কিন্তু যারা সেই মমতাটি অনুভব করতে পারে না আমি তাদের জন্য এক ধরনের করুণা অনুভব করি। পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। সন্তানের জন্য, মায়ের জন্য, পিতার জন্য, মানুষের জন্য, দেশের জন্য ভালোবাসা। আমার মনে হয় দেশের জন্য ভালোবাসা সবগুলো ভালোবাসার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কারণ দেশের জন্য ভালোবাসা সবচাইতে শক্ত ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা কেউ কিছু ফিরে পায় না, শুধু দিতে হয়। কাজেই যারা দেশকে ভালোবাসতে পারে তাদের মতো সৌভাগ্যবান মানুষ খুব কম। আমি চাই আমাদের দেশে সেই ধরনের নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠুক, যারা দেশটাকে ভালোবাসবে। হয়তো দেশটি দরিদ্র, দেশ দুর্নীতিতে সর্বশেষ্ঠ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নাম হচ্ছে। হয়তো দেশে অনেক দুর্নীতিবাজ মানুষ আছে, দেশে সন্ত্রাসী আছে, শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল, অনেক সমস্যা থাকতে পারে, তারপরেও দেশটিকে ভালোবাসতে হবে। কারণ ভালোবেসে দেশটিকে ঠিক করতে হবে। এটি কোনো আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা নয়, অত্যন্ত সত্য কথা। এবং এটা সম্ভব।

আমি ইচ্ছা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যেতে পারতাম। আমার জীবনে এর থেকে বড় কোনো ডিসিশন নেইনি। যদি সেখানে থেকে যেতাম, অর্থ-বিত্ত, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে খুব ভালো জায়গায় থাকতে পারতাম। কিন্তু এখানে এসে আমি যে আনন্দ পেয়েছি সেটা পেতাম না। আমি নতুন প্রজন্মকে একটা কথা বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। 'গণিত অলিম্পিয়াড' নামে একটা জিনিস আমরা শুরু করেছি। কিছু শিক্ষক মিলে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাই। সেখানে ছোট বাচ্চাদের একত্র করে নিয়ে এসে উৎসাহ দেই। তাদের ভেতরে একটা প্রতিযোগিতা করি- যে গণিতে সবচেয়ে ভালো তাদেরকে আমরা পৃথিবীর গণিত অলিম্পয়াড প্রতিযোগিতায় যেটা হবে মেক্সিকোতে, সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। প্রতি বছর সেটা করা হবে। আমি যদি যুক্তরাষ্ট্রে থাকতাম, আমি সেটা করতে পারতাম না। আমার দেশে সেটা করতে পারছি। নিজে একটা জিনিস শুরু করতে পারছি যেটা দেশে ছিল না। পারছি কারণ আমার দেশটা দুঃখী দেশ, এদের কিছু নেই।

এখানে যারা আছে নতুন প্রজন্ম আমি তাদের বলে দেই, আপনারা ইচ্ছা করলে অনেক দেশে যেতে পারবেন। সেখানে u will be nobody. বিশাল জনসংখ্যার সঙ্গে মিশে গিয়ে শুধু জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থবিত্ত করে, ভালো বাড়ি-ঘর কিনে, ভালো গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কেউ যদি এ দেশে থাকে, দেশের জন্য যদি কারো মমতা থাকে, সে এমন কিছু দেশের জন্য করতে পারবে, এমন একটা আত্মতৃপ্তি পাবে যা পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে পাবে না। কাজেই নিজের দেশটাকে ভালোবাসতে হবে। নিজের দেশকে ভালোবাসার মতো আনন্দ আর কোথাও নেই।

গণিত অলিম্পিয়াড ঢাকায় যখন হয়েছিলো, সমস্ত বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এসেছিলো। আমরা একটা ঘণ্টা রেখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'সারপ্রাইজ'। আগে থেকে বলবো না সেখানে কি হবে। সেখানে কি করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। ছেলেমেয়েরা সারা দিন অঙ্ক করে টায়ার্ড থাকবে, তাদের মানসিকভাবে আরাম দেয়ার জন্য এমন কিছু করতে হবে যেন তারা আনন্দ পায়। আমরা সেই সারপ্রাইজ আওয়ারে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এসেছিলাম এবং তারা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দেখে আমাদের এতো ভালো লেগেছিল, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিল। সেখানে বাংলাদেশের বীর প্রতীক, বীর বিক্রম, দু'বার বীর প্রতীক পেয়েছে সে রকম মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন। কেউ সেনাবাহিনী থেকে, কেউ সিভিলিয়ান থেকে মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের প্রশ্ন করেছে। আমাদের ছোট ছেলেমেয়েরা যখন সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের ভেতরে যে পরিবর্তনটা হয়েছে আমরা সেটি একদম দিব্য চোখে দেখতে পেয়েছি। আমরা জানি। তারা আর কোনোদিন কোনো রাজাকারকে প্রশ্রয় দেবে না। তাদের যদি ভোট দেয়ার ক্ষমতা থাকে, দেশে কোনোদিনই মতিউর রহমান নিজামীরা মন্ত্রী হতে পারবে না। একটা মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনারা যে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করলে তো মানুষকে হত্যা করতে হয়। মানুষকে হত্যা করতে আপনাদের খারাপ লাগেনি? একজন উত্তর দিলেন, আমরা কি মানুষ হত্যা করেছি? আমরা তো পশু হত্যা করেছি। ওরা নরপশু। আরেকজন জিজ্ঞাসা করলো, এখনো অনেক নরপশু আছে, আমরা ওদেরকে হত্যা করি? সে জানে আমাদের দেশে এখনো নরপশু আছে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। এখনো আমাদের দেশে নরপশু আছে, সেই সময় যারা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদেরকে হত্যা করেছিলো, তারা এখন ক্ষমতায় আছে। আমরা এখন তাদের হত্যা করি? তখন বললেন, না। এখন দেশে একটা আইন আছে। এটা মানতে হবে। তখন যুদ্ধাবস্থা চলছিলো। ব্যাপারটা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বুকের ভেতর একটা বল পেয়েছি।

আমাদের দেশটা এখন একটা টালমাটাল অবস্থায় চলে যাচ্ছে, একটা প্রজন্মকে অন্তত বোঝানো হয়েছে আগে যা হয়েছে ভুলে যাও। এখন সবাই মিলে নতুন একটা বাংলাদেশ গড়বো।

আমরা চেয়েছিলাম অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। যেখানে ধর্ম, গায়ের রঙ, সে বাঙালি, সাঁওতাল, মগ, মুরং, নাকি চাকমা কিছু আসে-যায় না। যারা এ ভূখন্ডে থাকে তাদের সমান অধিকার। আমার মনে হয় আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ জিনিসটা বুঝতে হবে একজন মানুষের ধর্ম কি সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়

কিন্তু আগে যা হয়েছে আমি ভুলবো না। ভুলতে পারি না। কারণ আমার ইতিহাস যদি দুর্বল, লজ্জার ইতিহাস হতো আমি এটা ভুলে যেতাম। আমি এবার জার্মানিতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প দেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম জার্মানির লোকজন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প কোথায় আছে সেটা বলতে চায় না। কারণ, এটা তাদের লজ্জার ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোয় তারা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছিল। কাজেই তারা এটা বলতে চায় না। তাই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প খুঁজে বের করা খুব মুশকিল। আমাদের তো লজ্জার ইতিহাস না, আমাদের এ তো গৌরবের ইতিহাস। আমি কেন সেই পুরনো ইতহাসটা ভুলে যাব? আমি পুরনো ইতিহাস ভুলতে রাজি নই। আমি নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাস শেখাতে চাই। বলতে চাই আমরা বীরের জাতি। যখন প্রয়োজন হয়েছিলো, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলো এবং যুদ্ধ শেষে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আবার হাতে লাঙ্গল ধরেছিল। সেই গল্প নতুন প্রজন্মকে বলতে চাই।

যেহেতু ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি একটা কথা বলে শেষ করে দেবো। গল্পটা আমি অনেক জায়গায় করেছি, আবার করি। আমি একটা কাজে রাজশাহী যাচ্ছিলাম। বাসে করে যাচ্ছি। রাস্তায় গাড়ি থেমেছে, তখন বাস থেকে এক ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। এসে বললেন, আমার মেয়ে বাসে ছিল, সে বলছে আব্বু দেখ ওই বুড়া মানুষটা হচ্ছে জাফর ইকবাল। শুনে মনটা একটু খারাপই হলো। কারণ চুলটা পেকে গিয়েছে, বুড়া মানুষ বলতেই পারে। কিছুদিন আগে আমাদের বগুড়া জেলা স্কুলের ১৫০ বছর পূর্তি। সেখানে গিয়ে পুরনো কিশোর বন্ধুদের ছবি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, তাদের বয়সটা আটকে গিয়েছে ১৫-১৬ বছর বয়সে, আর কোনোদিন বাড়বে না। আর আমি আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে গিয়েছি, হয়তো আরো বুড়ো হবো। ছবিটা দেখে আমার ভেতরে এমন একটা কষ্ট হলো, আমার মনে পড়লো যে, আমার স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে আমাদের স্কুলে শুয়ে থাকতাম, গল্প করতাম, আমি বড় হয়ে এটা হবো, এটা করবো। আমি বিদেশে যাবো, বৈজ্ঞানিক হবো, অমুক হবো, তমুক হবো, দু'জনে মিলে খুব গল্প করতাম। আমি আবিষ্কার করলাম, ছোট থাকতে যা কল্পনা করতাম তার অনেকগুলো জীবনের ভেতর পেয়ে গিয়েছি। সত্যি সত্যি বিদেশে গিয়েছি, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছি, আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। শুধু তাই না, আমার একটা পরিবার আছে, সবকিছু আমি পেয়ে গিয়েছি। আর যে ছেলেটা আমার সঙ্গে একই জিনিস কল্পনা করেছে, সে কিছুই পায়নি। সেই ১৬-১৭ বছর বয়সে যুদ্ধ করে মারা গিয়েছে। এই ফিলিংসটা, অসাধারণ একটা কষ্টের ফিলিংস। আমার কিশোর বন্ধুরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলো। বিশেষ করে একটা ভালোবাসার দেশ তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলো। সেই স্বপ্নটা যদি সত্যি না হয় তাহলে আমাদের রক্তের ঋণ শোধ হবে না। আমি এজন্য নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের প্রজন্মে যারা ছিলেন তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। এর পরবর্তী প্রজন্মে যারা আছে তাদেরকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় যে দেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছিলো সেই দেশ যদি গড়ে তোলা না হয় তাহলে সেই ঋণ শোধ হবে না।

(গত ১২ মার্চ ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মুহম্মদ জাফর ইকবাল একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার অনুলেখনটি ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের জন্য পত্রস্থ হলো)

শ্রুতিলিখন : **হাসান জামান খান**